নেই তাই খাচ্ছ

নেহাৎ মাটির তৈরি, হাঁটতে পারেন না, তবু পশ্চিমবঙ্গের সেরা মডেল হয়ে তিনি
থাকবেন পাঁচ দিন। এবং এর সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই।

লিখছেন

সমরেশ মজুমদার

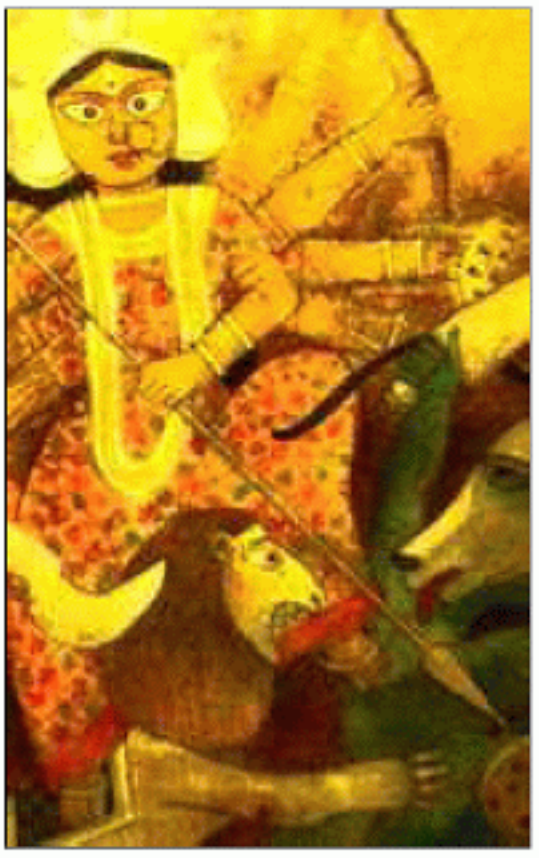

শৈশবে আমি ডুয়ার্সের চায়ের বাগানে থাকতাম। তখন ওই তল্লাটে একটাই পুজো হত। ঠাকুর গড়ার কারিগর আসতেন মাস দুই আগে। শ্রাবণী পূর্ণিমায় বাঁশের গায়ে খড় লাগানো শুরু হত। একটু একটু করে চোখের সামনে প্রতিমা হয়ে দাঁড়াতেন দুর্গা, তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে। রং, চুল এবং শেষে চোখ আঁকা শেষ হতেই জোরসে কাঁসর ঘণ্টা বাজানো হত। বড়রা বলতেন মায়ের প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। সেই বালকবেলায় মণ্ডপে দাঁড়িয়ে আমি কার্তিক-গণেশদের ভীষণ অপছন্দ করতাম। যাদের মা ও রকম অসুরের সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধ করছেন, তারা কেন আমাদের দিকে পোজ মেরে তাকিয়ে আছে? মাকে কেন সাহায্য করছে না ওরা? এই সময় কাদুপিসি নামে এক বুড়ি প্রায়ই আক্ষেপ করতেন তাঁর ছেলেরা বড় হয়ে ডানা মেলে উড়ে গেছে। তাঁকে দেখে না।

আমার মনে হত কার্তিক-গণেশ কাদুপিসির ছেলেদের মতো স্বার্থপর।

অল্প বয়সে পুজো মানেই উৎসব। নতুন জামা, জুতো। শহরে আসার পরে পুজোর ক'দিন মণ্ডপে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখতাম। বন্ধুরা জুটে গেলে, একটু বড় হলে, ঠাকুর দেখার অছিলায় মেয়েদের দেখতে যেতা ম। আমি স্থির জানি, ওরাও সেজেগুজে আসত আমাদের দেখতে। তখন চোখের দেখাতেই মন ভরে যাওয়ার বয়স ছিল।

আমার পিসিমা খুব ভক্তিময়ী মহিলা ছিলেন। প্রায়ই পুরোহিত আসতেন পুজো করতে। পিসিমা সংস্কৃত মন্ত্র হাত জোড় করে ভক্তি ভরে শুনতেন। পুরোহিত দেবভাষায় মন্ত্র পড়ছেন, সেই ভাষার বিন্দুবিসর্গ জানা না থাকা সত্ত্বেও ভক্তি একটুও কমত না। আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি, একটু-আধটু সংস্কৃত শিখেছি, তখন ও রকম এক পুজোর সময় শুনতে পেলাম পুরোহিত ভুল উচ্চারণ করছেন। সেটা বলতেই তিনি প্রতিবাদ করলেন এবং পিসিমা আমাকে ঠাকুরঘর থেকে বের করে দিলেন।

বাঙালি পৌরাণিক দেবদেবী এবং তাঁদের পূজাপদ্ধতি জেনেছে বড়জোর এক হাজার বছর আগে। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সংস্কৃত চর্চা কর লেও, বেশির ভাগ মানুষ ওই ভাষা না বুঝেই দেবদেবীর আরাধনা করে গেছেন এত কাল। আমরাও বাবা-ঠাকুরদার পথেই চলেছি অনেক কাল। যা আমার ভাষা নয়, সেই ভাষায় কী করে দেবতার কাছে আর্তি জানানো যায়, তা নিয়ে এক সময় সংশয় এল। আর্যরা এই বঙ্গভূমিতে পা দেয়নি। সেই অর্থে আমরা তো অনার্য। হাজার বছর আগে পাথর পুজো করতাম। মুসলমান আক্রমণের পর পূর্বপুরুষেরা নড়েচড়ে বসে আর্যদের ধর্মাচরণের দিকে হাত বাড়ালেন ম্লেচ্ছ হতে না চেয়ে। এই ব্যাপারটার মধ্যে এত জল মিশেছিল যে, আমাদের আজ পর্যন্ত কোনও সঠিক ধর্মাচরণ-পদ্ধতি তৈরি হয়নি। খ্রিস্টানদের বাইবেল আছে, মুসল মানদের কোরান, বাঙালিরা, যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলেন, তাঁদের কোনও ধর্মগ্রন্থ নেই। বেদ আর্যদের, সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল জীবনযাপনের সুস্থ ভাবে পথ দেখাতে। এক লক্ষে দশ জন বাঙালি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাঁরা বেদের সমস্ত খণ্ড পড়েছেন।

যখন কুলগুরুদের মাধ্যমে দেবদেবীর পুজো বাঙালি জেনে গেল, তখন প্রথম পাঁচশো বছরেই ভাগাভাগি শুরু হয়েছিল। শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত—

এই তিন শ্রেণির তথাকথিত হিন্দু হয়ে পরস্পরকে ছোট করতে তাদের উদ্যমে ঘাটতি হল না। এবং তখন থেকেই বাঙালি একটি ধর্মগ্রন্থ তৈরি করে ফেলল, যার নাম গীতা। শ্রীকৃষ্ণ যে সব বাণী দিয়েছেন, তা ওই গ্রন্থে গ্রন্থিত। ওপরে শ্রীকৃষ্ণের ছবি, বাঙালি ভক্তি ভরে ঠাকুরঘরে গীতা রাখল। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যেত, 'গীতা? কেন শ্রীকৃষ্ণের লেখা'। কখন লিখলেন শ্রীকৃষ্ণ? কেন? কুরুক্ষেত্রে বসে বসে অর্জুনকে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন, সেগুলোই গীতাতে লেখা আছে। তখন তো টেপ রেকর্ডার ছিল না, কোনও স্টেনোগ্রাফার সেগুলো ডিক্টেশন নিয়েছিল নিশ্চয়ই? সঙ্গে সঙ্গে খুব রেগে যেতেন পিসিমা, 'দেবতাদের নিয়ে ঠাট্টা করছিস? তুই কী রে!'

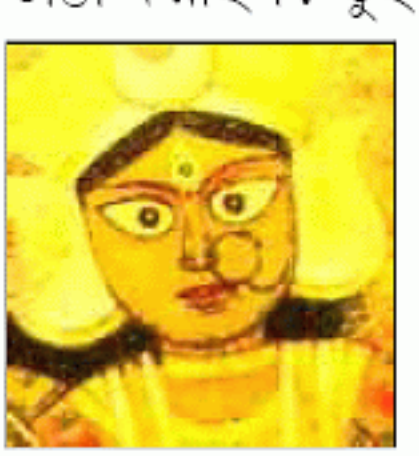

গোলমালটা এখানেই। ব্যাসদেব মহাভারত লিখেছিলেন। তার প্রতিটি ঘটনা এবং চরিত্র ব্যাসদেবের কল্পনাপ্রসূত। ব্যাসদেবের সৃষ্ট কৃষ্ণ-চরিত্রের মুখ দিয়ে যে সব সংলাপ বলানো হয়েছে, তা লেখকেরই লেখা। অথচ, গীতা ব্যাসদেবের লেখা বললে ওই গ্রন্থের কৌলিন্য কমে যায়। ভক্তিভাব তরল হয়ে আসে বলে বাঙালি ভেবেছে বইটি শ্রীকৃষ্ণের লেখা।

এই ভাবতে ভাল লাগে বলে গত পাঁচ-ছশো বছর ধরে অনেক অবাস্তব ব্যাপার পরম নিষ্ঠা ভরে বাঙালি হিন্দু গ্রহণ করে এসেছে। কিন্তু যা অসার, তার তো আসল চেহারা বেরুবেই। সেটা গত তিরিশ বছরে বেরিয়ে আসছে খুব দ্রুত। ধর্মের প্রয়োজন আমাদের সমাজজীবনে একটি শৃঙ্খলা তৈরি করা। যা কোরান কিংবা বাইবেল তৈরি করেছে। তথাকথিত হিন্দুরা সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত।

কৈশোর বয়সে আগমনী গান শুনতাম। শ্বশুরবাড়ি থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়িতে আসছে মেয়ে। সেই মেয়েই আমাদের মা। মা উমা আসছেন, তাই কাশফুল আরও সাদা হয়েছে, আকাশ হয়েছে মন-কেমন-করা নীল। ভোরের শিউলি ঘাসের ওপর সাদা চাদর বিছিয়েছে। মা আসছেন। সে কী উন্মাদনা ছিল আমাদের। নতুন জামা,

নতুন জুতো। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। শুধু নিজেদের প্রতিমা নয়, ঘুরে ঘুরে অনেক প্রতিমা দেখতাম তখন। এক এক জায়গায় একটু অন্য রকম প্রতিমা কেন? এক বন্ধু ধমকেছিল, 'তুই কিস্যু বুঝিস না। আমাদের সবার বাড়ি কি এক রকম? কেউ ঝাল বেশি খায়, কেউ মিষ্টি দেওয়া তরকারি, তাই মায়ের চেহারা তো একটু বদলাবেই।' মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু, দশমীর সকাল থেকেই মন খারাপ হয়ে যেত। বিকেলে এয়োদের সিঁদুর পরানোর পরে মনে হত প্রতিমার চোখ ছলছল। আমার এক আত্মীয়াকে সেই বয়সে মারা যেতে দেখেছিলাম। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে তাঁর কপালে এবং গায়ে সিঁদুর পরানো হয়েছিল। তার পর শোকে মুহ্যমান একটি শোকযাত্রার পর শ্মশানে গিয়ে যখন দাহ করা হয়েছিল, তখন অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। অথবা আমাদের পরিবারের মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি থেকে বেড়াতে এলে খুব হইচই হত। কিন্তু তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন যখন, তখন তাঁদের চোখ দিয়ে জল পড়ত। আমরাও ফুঁপিয়ে কাঁদতাম। অথচ, যে প্রতিমার চোখ ছলছল, যাঁকে ভাসানের জন্যে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানের পাশের নদীতে, সেখানে চলল উদ্দাম আরতি আর কান-ফাটানো ঢাকের আওয়াজ। তদ্দিনে ইংরেজি ছবিতে ক্যানিবালদের দেখেছি। হঠাৎ মনে হত, প্রতিমাকে ঘিরে সেই ক্যানিবালেরা নাচছে আনন্দে। প্রতিমা জলে পড়ার পর কী উচ্ছ্বাস! এ ওকে জড়িয়ে কোলাকুলি করছে। 'শুভ বিজয়া' শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল কারও মনে এতটুকু দুঃখ নেই কেন? তা হলে কি প্রতিমা গড়া হয় নিরঞ্জনের পরের আনন্দের জন্যে? বড়দের প্রণাম করতে হত, তাঁরা বিজয়ার আশীর্বাদ দিতেন। প্রতিমা চলে গেছেন বলে এত উৎসব কেন? আমার জীবনের প্রথম প্রেমপত্র পেয়েছিলাম ওই বিজয়ার রাত্রে। তাতে ে মেয়েটি লিখেছিল, বিজয়ার ভালবাসা নিও। বিজয়া মানে যদি বিয়োগজনিত দুঃখের সময়, তা হলে তাতে ভালবাসা জন্মায় কী করে? মেয়েটির সঙ্গে এ জীবনে কথা বলিনি।

ধন্দটা বাড়তে বাড়তে এক সময় এল যখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামাই না। দেশজুড়ে বাৎসরিক পুতুলখেলা চলছে, চলুক না! ব্রহ্মার বরে বলীয়ান মহিষাসুর দেবতাদের যখন নাজেহাল করছে, তখন সব দেবতা হাজির হলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু জানতেন কোনও পুরুষের হাতে মহিষাসুর মারা যাবে না। তিনি দেবতাদের উপদেশ দিলেন, 'যাও,

সবাই নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হও। প্রত্যেকে প্রার্থনা করো, সেই মিলন থেকে একটি তেজ যেন

উৎপন্ন হয়, এবং সেই তেজরাশি মিলিত হয়ে একটি নারীমূর্তি সৃষ্টি করবে।' তাই হল। দেবতারা তাঁদের সেরা অস্ত্র ওই নারীকে দান করলেন। এই নারী তিন বার মহিষাসুরকে বধ করেন। প্রথম বার অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা হয়ে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার দশভুজা রূপে। এর পরে কোনও কাহিনিতে দুর্গার তেমন উল্লেখ আমি দেখিনি। তা হলে এই দুর্গা কে? তিনি যদি বিষ্ণুর পরামর্শে সৃষ্ট হন এবং মহিষাসুর বধ করেন, তা হলে তাঁর সঙ্গে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসা মা দুর্গার কোনও সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া ইনি শিবের স্ত্রী নন। অথচ, প্রতিমা গড়ার সময় মহিষাসুরকে হত্যা করার মুহূর্তে দুর্গার মাথার ওপর চালচিত্রে শিবের অলস মূর্তি বসানো থাকে। এ সব কার পরিকল্পনা?

বাঙালির চোখে দুর্গা শিবের স্ত্রী। শিবের বাড়ি কৈলাস পর্বতে। সেটা দুর্গার শ্বশুরবাড়ি। বাঙালির কাছে উমা দুর্গার ডাকনাম। ভাল কথা। প্রতি বছর শরৎকালে এই উমা আসেন ছেলেমেয়ে নিয়ে বঙ্গভূমিতে, যেটা তাঁর বাপের বাড়ি। তাই এই উৎসব, এত আনন্দ। কিন্তু, পৌরাণিক কাহিনিতে উমা হলেন গিরিরাজ হিমালয় এবং তাঁর স্ত্রী মেনকার কন্যা। উমা আগের জন্মে দক্ষের মেয়ে ছিলেন, শিবের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করে হিমালয়ের কন্যা হিসেবে আবার জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি আবার শিবকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার জন্যে তপস্যা শুরু করেন। সেটা সহ্য করতে না পেরে মা মেনকা বলেছিলেন, তপস্যা কোরো না। উচ্চারিত হয়েছিল, 'উ', 'মা'। হয়তো সেটাই 'উমা' হয়ে দাঁড়াল। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

কাহিনি যদি এই হয়, তা হলে মার বাপের বাড়ি হিমালয়, শ্বশুরবাড়ি কৈলাসে। সেখানে বঙ্গভূমির মানুষের কিচ্ছু বলার থাকে না। হিমালয়ের মানুষেরা সাধারণত মঙ্গোলিয়ান চেহারার হন। নেপালি, ভুটিয়া, সিকিমের মানুষের যেমন চেহারা হয়। অতএব উমার চেহারাও সেই ধাঁচের হওয়া স্বাভাবিক। অথচ, প্রায় পাঁচশো বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে দুর্গাপুজোর আমদানি করলেন, তাঁর মূর্তি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীর, নাক টিকলো, বাঙালির চেতনায় যেমন মুখশ্রী হওয়া উচিত, তেমনই। উমার বাবা-মা এখানকার মানুষ না হওয়া সত্ত্বেও কেন বাঙালি

প্রতি বছর বলছেন, মা আসছেন বাপের বাড়িতে? এর জবাব চমৎকার দিয়েছে একটি এগারো বছরের মেয়ে, 'ওয়ার্ল্ড কাপে ব্রাজিল খেলতে নামলেই কলকাতার রাস্তায় ও দেশের পতাকা ওড়ে, রাস্তায় রাত জেগে ছেলেরা খেলা দ্যাখে, জিতলে চিৎকার করে, মনে হয় যেন ভারত ওয়ার্ল্ড কাপে খেলছে। এও তেমনই।'

এই মেয়েটির বাবার গায়ে একদা পৈতে ছিল। পূর্বপুরুষ সূত্রে তিনি ভট্টাচার্য। একেবারে খাঁটি ব্রাহ্মণ। কিন্তু, মেয়েটি শৈশব থেকে দেখে এসেছে তাদের বাড়িতে বৃহস্পতিবারে শাঁখ বাজে না। শুধু তাদের বাড়ি কেন, এখন সন্ধেবেলায় গোটা পাড়ায় শাঁখের শব্দ শোনা যায় না। বাড়িতে ঠাকুরদেবতার ছবি নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আর মা সারদার ছবি আছে। অতএব, এই মেয়েটি বাড়িতে পুজোআর্চা হতে দ্যাখেনি। জ্ঞান হওয়ার পরেই সে জেনেছে পুজো মানেই কোথাও বেড়াতে যাওয়ার মজা। তিন মাস আগে মা-বাবা অনেক তর্কের পরে ঠিক করেন জায়গাটা। বাবা টিকিট কাটেন, হোটেল বুক করেন। মাঝে মাঝে এমন জায়গায় সে বাবা-মার সঙ্গে গিয়েছে, যেখানে ঢাকের বাজনা শোনা যায় না। কিন্তু, বেড়াতে পারার আনন্দে সে কোনও অভাব বোধ করে না। কালীপুজোর সময়টা ভয়ংকর। তখন এত অল্প ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যায় না। দিনরাত জানলা বন্ধ করে বসে থাকতে হয় পটকার আওয়াজ থেকে বাঁচতে। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'জেঠু, কালীপুজোর সময় বৈষ্ণবরা কী করেন?'

এখন যাঁদের তিরিশ কী পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, তাঁদের জীবনে তথাকথিত হিন্দুধর্মের কোনও ভূমিকা নেই। যত দিন যাচ্ছে, তত আমাদের পূর্বপুরুষের তৈরি বালির প্রাসাদ একটু একটু করে ধসে পড়ছে। ধর্ম গেছে, তবু পুজো আঁকড়ে ঘরের বাইরে চলছে উৎসবের বাবুবিলাস।

কথা হচ্ছিল একটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সঙ্গে। দেখলাম, সে বইপত্র পড়েছে, পড়ে মাথামুণ্ড বুঝতে পারছে না। সে আমাকে প্রশ্ন কর ল, 'আচ্ছা, এই দুর্গা চার জনকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন পুজোর সময় এই ভাবনা প্রথম কার মাথায় এসেছিল?'

'কেন?'

'এক জায়গায় পড়ছি, দেবতারা এবং দানবেরা যখন সমুদ্র মন্থন কর

ছিলেন, তখন লক্ষ্মী সমুদ্রের নীচ থেকে উঠে এসেছিলেন। আবার এক জায়গায় পড়লাম, লক্ষ্মীর বাবা-মা হলেন মহর্ষি ভৃগু এবং দক্ষকন্যা খ্যাতি। আবার, আমরা বলি লক্ষ্মী দুর্গার মেয়ে। আবার দেখুন, সরস্বতী সম্পর্কে আমরা জানি, তিনি দুর্গার মেয়ে। অথচ, বইতে পড়ছি, তিনি কৃষ্ণের মুখ থেকে আবির্ভূত হন। তিনি শুক্লবর্ণা, হাতে বীণা এবং চাঁদের শোভা সর্বাঙ্গে। তা হলে তিনি দুর্গার মেয়ে হচ্ছেন কী করে? তা হলে এঁদের কেন দুর্গার পাশে রেখে পুজো করা শুরু হল?' ছেলেটি কূল পাচ্ছিল না।

হঠাৎ, ছেলেবেলার প্রশ্নটি মনে আসতে ওকে জানালাম। সে হাসল, 'বাঃ! ওরা দুর্গার কেউ নয়। দুর্গা যুদ্ধ করছে বলে ওরা চিন্তিত হবে কেন?' স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, ছেলেবেলায় এই স্পষ্ট উপলব্ধি আমার হয়নি।

আর কিছু দিন বাদেই মহালয়া। বারোয়ারি পুজো কমিটি ব্যস্ত তাদের বৈভব দেখানোর জন্যে। এই সঙ্গে মিডিয়া আর ব্যবসায়িক মহল উদগ্রীব তাদের প্রচারে। বিউটি কনটেস্টের মতো দুর্গার এক দুই তিন নম্বর বিচার হবে। নেহাৎ মাটির তৈরি, হাঁটতে পারেন না, তবু পশ্চিমবঙ্গের সেরা মডেল হয়ে তিনি থাকবেন পাঁচ দিন। এবং এর সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই।

পুজো মানেই নতুন জামা, পুজো মানেই পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। এটাই সত্যি। যেখানে রামচন্দ্র অকালবোধনের আয়োজন করেছিলেন, সেখানে এই দুর্গার কথা কেউ জানে না। উত্তর প্রদেশে দশেরায় রাবণ পোড়ানো হয়, বাঙালি নিজের মতো করে বিভিন্ন পুরাণ থেকে টুকুন টুকুন নিয়ে এই দুর্গাকে তৈরি করেছে। পায়ের তলায় ধর্মের শক্ত মাটি কোনও দিন যে জাতির ছিল না, তাদের ঠাকুরঘর আজ বারোয়ারি মণ্ডপে চলে এসেছে। যেখানে ধর্মের বদলে উৎসবের উল্লাস।

পুজোয় কী করছেন? অনেক দিন আগে নীললোহিতের লেখা

পড়েছিলাম। যার সঙ্গে দেখা হয়, তিনিই বাইরে বেড়াতে যাচ্ছেন। নীলের পয়সা নেই। অতএব তার সিদ্ধান্ত, তাকে কলকাতায় থাকতে হবে। নইলে কলকাতার সুন্দরীদের কে দেখবে? এই লেখা বেশ কয়েক বছর আগের। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পুজোয় বাইরে যাচ্ছেন?'

'নাঃ। এ বার চার দিনের বেশি ছুটি পাচ্ছি না।'

'কী করবেন এই চার দিন?'

'আর বলবেন না। সকালে বিয়ার সেবন, দুপুরে ভদকা, তার পর একটু ভাতঘুম। সন্ধেয় হুইস্কি সহযোগে রাত বারোটা পর্যন্ত জব্বর আড্ডা।'

'মণ্ডপে যাবেন না? আরতি—'

'আমাকে পাগল-মশা কামড়ায়নি, ভাই।'

'দেবী দুর্গা—'

'দুর! যাঁকে দেবতারা প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিল, আজ অবধি স্বর্গে ঢুকতে দেয়নি, যিনি বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন না, তাঁকে নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।'

তথাকথিত হিন্দুধর্মে যাঁদের প্রবল আস্থা, এই বঙ্গভূমিতে তাঁদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। সুযোগসন্ধানী, ফুর্তিবাজদের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। এটাই স্বাভাবিক। ধর্মের সুযোগ নিয়ে বঙ্গোপসাগরের জলকে মিষ্টি করতে তথাকথিত হিন্দুরা যজ্ঞ করে, প্রচারিত হয়। এর পরেও কি নিজেকে হিন্দু ভাবতে পারি?